

কলাম

মতামত

গবেষণার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে, নাকি আমলাতন্ত্রের কবজায়



মো. সাহাবুল হক

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক

প্রকাশ: ১২ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৪৭



রাষ্ট্র কি বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণা পরিচালনার মতো সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বাস করে?

বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় কি বেশি নিয়ন্ত্রণে গড়ে ওঠে, নাকি বেশি স্বাধীনতায়—প্রশ্নটি আজ বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সরকার আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান উন্নত করার কথা বলছে। অন্যদিকে গবেষণা অনুদান সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের যুক্তি, এতে স্বচ্ছতা ও

জবাবদিহি বাড়বে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি বড় অংশের আশঙ্কা, এতে গবেষণা আরও আমলাতান্ত্রিক হবে এবং একাডেমিক স্বায়ত্তশাসন সংকুচিত হবে।

তাই আলোচনার কেন্দ্রে অর্থ নয়, কেন্দ্রে রয়েছে আস্থা। রাষ্ট্র কি বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণা পরিচালনার মতো সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বাস করে? নাকি তাদের ওপর আরও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চায়? এই প্রশ্নের উত্তরই বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় শুধু তার শ্রেণিকক্ষ বা ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ নয়। তার প্রকৃত পরিচয় গড়ে ওঠে গবেষণায়। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, নীতিনির্ধারণে অবদান ও সমাজের বাস্তব সমস্যার সমাধান— এসবই বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে সম্ভব। এ কারণেই বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল্যায়নে গবেষণার মান, প্রকাশনা, সাইটেশন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও গবেষণার বাস্তব প্রভাবকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বাংলাদেশেও গবেষণার চিত্র ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। একসময় বলা হতো, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু পাঠদান করে, গবেষণা করে না। কিন্তু সাম্প্রতিক তথ্য সেই ধারণাকে আর সমর্থন করে না। স্কোপাসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশি গবেষকেরা ১৫ হাজার ৪১৩টি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। একই বছরে ওয়েব অব সায়েন্স কোর কালেকশনে সূচিভুক্ত হয়েছে ১৩ হাজার ২৮০টি গবেষণা। শুধু প্রকাশনার সংখ্যা নয়, গবেষণার সাইটেশনও ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতায়ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণ আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশেরও সেই পথেই হাঁটা উচিত। কারণ, বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় কোনো প্রশাসনিক নির্দেশে গড়ে ওঠে না। গড়ে ওঠে গবেষণার স্বাধীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও কঠোর জবাবদিহির সমন্বয়ে। গবেষণার অর্থ কোথায় থাকবে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো গবেষণার স্বাধীনতা কার হাতে থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক তথ্যও একই বার্তা দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনো দেশের বৃহত্তম গবেষণাপ্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি বুয়েট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিও ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য গবেষণা প্রকাশ করছে। অর্থাৎ গবেষণা এখন আর ব্যতিক্রম নয়, এটি ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে।

এই অগ্রগতি অবশ্য সহজে আসেনি। সীমিত গবেষণা বাজেট, আধুনিক গবেষণাগারের অভাব, যন্ত্রপাতির সংকট এবং অতিরিক্ত পাঠদানের চাপের মধ্যেও গবেষকেরা এই সাফল্য অর্জন করেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে—যখন গবেষণা এগোচ্ছে, তখন গবেষণা পরিচালনার কাঠামোকে আরও কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন কেন?

অবশ্যই সরকারের উদ্বেগকে অস্বীকার করা যায় না। গবেষণা অনুদানের অপব্যবহারের অভিযোগ নতুন নয়। কোথাও মানহীন গবেষণা, কোথাও একই ধরনের প্রকল্পে পুনরায় অর্থায়ন, আবার কোথাও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। জনগণের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কঠোর জবাবদিহি নিশ্চিত করতেই হবে। কিন্তু এখানেই মূল নীতিগত প্রশ্নটি আসে। জবাবদিহি কি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সমার্থক? বিশ্বের সফল গবেষণা ব্যবস্থা বলছে—না।

যুক্তরাজ্যে ইউকে রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন (ইউকেআরআই), অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ কাউন্সিল (এআরসি), যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন (এনএসএফ) গবেষণা অনুদান দেয়, প্রতিযোগিতামূলক মূল্যায়ন পরিচালনা করে এবং প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে গবেষণা পরিচালনা করে না। কারণ, গবেষণা প্রশাসনিক কাজ নয়, এটি একটি একাডেমিক কার্যক্রম। অর্থদাতা সংস্থা জবাবদিহি নিশ্চিত করে আর বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পরিচালনা করে। এই ভারসাম্যই আন্তর্জাতিকভাবে সফল গবেষণা ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভূমিকাও সেই দিকেই শক্তিশালী হওয়া উচিত। কমিশনের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত গবেষণার মান নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক মানের পিয়ার-রিভিউ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অডিট পরিচালনা ও গবেষণার ফলাফল মূল্যায়ন করা। কিন্তু গবেষণা প্রকল্পের প্রতিটি প্রশাসনিক ধাপ নিজেদের হাতে নেওয়া দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর হবে কি না, সেটিই এখন আলোচনার বিষয়।

কারণ, গবেষণা সময়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিযোগিতা। অনেক ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে গবেষণার যন্ত্রপাতি কিনতে হয়, আন্তর্জাতিক অংশীদারের সঙ্গে দ্রুত চুক্তি করতে হয়, গবেষণা সহকারী নিয়োগ দিতে হয় অথবা নির্দিষ্ট মৌসুমে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এসব সিদ্ধান্তে বিলম্ব মানেই গবেষণার ক্ষতি। অতিরিক্ত প্রশাসনিক স্তর যোগ হলে সেই ঝুঁকি আরও বাড়বে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উচ্চশিক্ষা খাতে কয়েকটি নীতিগত সিদ্ধান্তও শিক্ষাবিদদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি করেছে। উদাহরণ হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ চালু না করার উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা যায়। (বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিষয় না পড়ানোর উদ্যোগ, ২১ মার্চ ২০২৫, দৈনিক প্রথম আলো) সমালোচকদের অভিযোগ ছিল এ ধরনের সিদ্ধান্তে পর্যাপ্ত গবেষণা, অংশীজনের মতামত ও নীতিগত বিশ্লেষণের ঘাটতি ছিল। গবেষণা অনুদানব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়েও একই প্রশ্ন উঠেছে—এটি কি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা ও তথ্যভিত্তিক মূল্যায়নের ফল, নাকি প্রশাসনিক সুবিধার বিবেচনায় নেওয়া সিদ্ধান্ত?

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে পরিচালিত প্রায় চার হাজার কোটি টাকার হায়ার এডুকেশন অ্যাক্সেলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট) প্রকল্প নিয়েও অনেক শিক্ষকের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, গত বছরের

গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়ন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম হয়েছে, যা জাতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকল্পের দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংকও প্রকল্পের ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এসব অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণের দায়িত্ব অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের, তবে এত গুরুতর প্রশ্ন ওঠার পরও সেগুলো নিয়ে দৃশ্যমান ও স্বাধীন তদন্তের অভাব উদ্বেগ তৈরি করেছে।

এ ছাড়া যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের গবেষণা অনুদান নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের অনেকেই জানেন যে প্রকল্প পরিচালনার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। দুই বছরের গবেষণা প্রকল্প শেষ হতে অনেক সময় তিন থেকে চার বছর লেগে যায়। যদি ইউজিসির নিজস্ব গবেষণা প্রকল্পগুলোই সময়মতো শেষ করা কঠিন হয়, আন্তর্জাতিক গবেষণা তহবিল সঠিকভাবে জবাবদিহির মধ্যে না রাখতে পারে, তাহলে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করা কতটা বাস্তবসম্মত, সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসে।

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখা জরুরি। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা গবেষণার অনিয়ম নয়, বরং গবেষণায় বিনিয়োগের ঘাটতি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেটের বড় অংশ ব্যয় হয় বেতন-ভাতা ও অবকাঠামো খাতে। গবেষণার জন্য বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে সীমিত। ইউজিসি জানিয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার জন্য ২২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় বেশি। এটি অবশ্যই ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি সেই অর্থ দ্রুত, দক্ষ ও গবেষকবান্ধব উপায়ে ব্যবহারের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হবে।

অর্থাৎ বিতর্কটি বরাদ্দ বাড়ানো না কমানোর নয়, বরং গবেষণা শাসনব্যবস্থার। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন মানে জবাবদিহিহীনতা নয়, আবার জবাবদিহি মানেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও নয়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার সাফল্য এই দুইয়ের সুষম সমন্বয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলাদেশেও সেই ভারসাম্য গড়ে তোলা সম্ভব। গবেষণা অনুদান প্রদানে আন্তর্জাতিক মানের পিয়ার-রিভিউ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। দেশি-বিদেশি স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। ডিজিটাল আর্থিক ট্র্যাকিং, নিয়মিত অডিট ও গবেষণার ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাও দিতে হবে।

রাষ্ট্রের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্দেহের নয়, সক্ষমতার চোখে দেখা। কারণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মতো ক্ষেত্রগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক গবেষণার ওপর। গবেষণাকে প্রশাসনিক ফাইলের মতো পরিচালনা করলে উদ্ভাবন জন্মায় না। উদ্ভাবন জন্মায় স্বাধীন চিন্তা, দ্রুত সিদ্ধান্ত ও একাডেমিক আস্থার পরিবেশে।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি খুবই সরল। আমরা কি এমন বিশ্ববিদ্যালয় চাই, যারা প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য অনুমতির অপেক্ষায় থাকবে? নাকি এমন বিশ্ববিদ্যালয় চাই, যারা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করবে, আন্তর্জাতিক গবেষণায় নেতৃত্ব দেবে এবং দেশের উন্নয়নের পথ দেখাবে?

বিশ্বের অভিজ্ঞতা বলছে, দ্বিতীয় পথটিই সফলতার পথ।

বাংলাদেশেরও সেই পথেই হাঁটা উচিত। কারণ, বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় কোনো প্রশাসনিক নির্দেশে গড়ে ওঠে না। গড়ে ওঠে গবেষণার স্বাধীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও কঠোর জবাবদিহির সমন্বয়ে। গবেষণার অর্থ কোথায় থাকবে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো গবেষণার স্বাধীনতা কার হাতে থাকবে।

- **ড. মো. সাহাবুল হক** অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

মতামত লেখকের নিজস্ব

